নানসেন ইনিশিয়েটিভ কর্মশালা বিষয়ে খসড়া অবস্থান পত্র

জলবায়ু উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুতিদের অধিকার: প্রেক্ষিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা

১. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের অধিকারকে আমরা কেন গুরুত্ব দিচ্ছি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রবণতার অন্যতম হচ্ছে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর এবং বাস্তুচ্যুতি। বিগত তিন দশক ধরে জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও ইদানিং বিষয়টি বৈশ্বিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে পৌনপৌনিক তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, অতিবন্যা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি এখন সাধারণ ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ধনী, দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল সকল দেশেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান হলেও উন্নয়নশীল, দরিদ্র এবং জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোতে এর প্রভাব অন্ত্যন্ত বেশি, যার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নিজের বাস্তুভিটা ও জীবন-জীবিকার সুযোগ ত্যাগ করে অন্যত্র অভিবাসনে বাধ্য হচ্ছেন। এই অভিবাসন দেশ এবং দেশের ভৌগোলিক গণ্ডি পেরিয়ে অন্য দেশের ভৌগোলিক সীমানায় সংগঠিত হওয়ায় এক ধরনের উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনা সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এই সংকটের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সামধানও জরুরি বিষয় হিসেবে আমাদের সকলের সামনে চলে এসেছে। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার বাইরেও বিভিন্ন প্লাটফরমে আলোচনা ও সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত, দরিদ্র এবং সর্বোপরি জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে গভীর সংকটে পড়তে পারে বলে আমরা আশংকা করছি, ফলে বাংলাদেশ সহ সকল জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর পক্ষে উক্ত বিষয়ে আমাদের আজকের এই অবতারণা।

২. জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক বাস্তুচ্যুতির পূর্বাভাস

জলাবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানান্তরের বিষয়টি চিহ্নিত করতে গিয়ে Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)-এর প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (১৯৯০) বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী যে সকল নেতিবাচক প্রভাব বা ফলাফল সৃষ্টি হবে তার মধ্যে এককভাবে এবং সর্ববৃহৎ প্রভাব হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী নতুন করে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সৃষ্টি বা Human Migration। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বৈশ্বিক উন্নয়নের গতিধারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হবে। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ও জীবন জীবিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে (UNDP Report 2007), যার ফলস্বরূপ স্থানান্তর ঘটবে। তবে বিগত বছরগুলোতে স্থানান্তর বা Human Migration-এর উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরম্যান মেয়ার (Norman Myers) বলেছিলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ২০৫০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) মানুষের স্থানান্তর ঘটতে পারে। পরবর্তীতে Stern Review on Economic of Climate Change -2006 এবং Christian Aid Report-2007 এর প্রতিবেদনে এবং অন্যান্য গবেষণায় প্রফেসর নরম্যান মেয়ারের এই অনুমানের উদ্ধৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ২০১০ সালে Nicholls et al. (2010) এর তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রমাণের সঙ্গে প্রফেসর মেয়ারের অনুমানলব্ধ উদ্বাস্তুর সংখ্যাকে সমর্থন করে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই শতকের মধ্যে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে প্রায় প্রায় ৭২ মিলিয়ন (সাতকোটি ২০ লাখ) মানুষ উদ্বাস্তু হতে পারে। এই বৃদ্ধি ০২ মিটার হলে বিশ্বের প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন (প্রায় ১৮ কোটি) মানুষ স্থানান্তরে বাধ্য হবেন। এই ভয়াবহ ঘটনার বেশিরভাগটাই ঘটবে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে। সর্বশেষ IPCC'র পঞ্চম প্রতিবেদনেও (AR5 2014, Working Group-II, Para 11.2.6.1) বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়াতে আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত চাপ তৈরি করবে এবং এর ফলে স্থানান্তর ঘটতে পারে।

৩. IPCC'র পর্যবেক্ষণ এবং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা

IPCC'র পঞ্চম প্রতিবেদনে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে সমর্থন করা হলেও বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটছে কিনা তার উপর IPCC'র নিজের উদ্যোগে কোন গবেষণা এখন পর্যন্ত করা হয়নি। তবে বিষয়ের উপর জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার বাইরে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে, যাতে বোঝা যাচ্ছে বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির ঘটনা IPCC'র পর্যবেক্ষণের চাইতে অনেক বেশি যা সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে।

জাতিসংঘের আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি মনিটরিং কেন্দ্র (Internal Displacement Monitoring Center-IDMC) এবং নরওয়ের শরণার্থী সংস্থা (Norwegian Refugee Council- NRC)-এর যৌথভাবে প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তাদের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন (People Displaced by Disaster, Global Estimate 2014) অনুসারে ২০১৩ সালে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায় ২২ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির বেশিরভাগ ঘটনা ঘঠছে এশিয়ার দেশগুলোতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১৩ সালে ৬০০-এর বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে এবং এর মধ্যে ৩৭টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিটি দুর্যোগে ১০০,০০০ এর বেশি জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবেদনটির বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২৭ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এবং এর মধ্যে ৮০.৯০% প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘঠিত হচ্ছে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে বাংলাদেশ, চীন, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামে। আমরা জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে শুধু এশিয়া অঞ্চলের তথ্য এখানে উপস্থাপন করেছি। এর বাইরেও আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলভিত্তিক তথ্যও রয়েছে, যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটছে এবং বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করারও যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

৪. বাংলাদেশে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি এবং শহরমূখী অবিভাসন ক্রমবর্ধমান

বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের উপর সরকারি কোন গবেষণা না থাকলেও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কিছু গবেষণা রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা হারিয়ে অন্যত্র অবিভাসন নিতে বাধ্য হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ২০ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ২০০,০০০ মানূষ তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তর হয়েছে, যাদের অধিকাংশ এখন পর্যন্ত নিজেদের বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা এবং জলবাবদ্ধতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ শহরের দিকে স্থানান্তর হচ্ছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশে নদী ভাঙন, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ও লবনাক্ততা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদের বেশির ভাগই দরিদ্র হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরমুখী হয়ে ঢাকা বা নিকটবর্তী কোন শহরে আবার কখনও অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তুচ্যুত মানুষের উপর স্থানান্তর প্রবণতার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রধান দুর্যোগ যেমন; বন্যা, ঘূর্ণিঝড়র এবং নদীভাঙ্গনের কারণে গত ৪০ বছর ধরে (১৯৭০-২০০৯) ৩৯ মিলিয়ন (প্রায় ৪ কোটি) লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে (আখতার, ২০০৯) যাদের অধিকাংশই বর্তমানে বিভিন্ন শহরে আশ্রিত।

বাস্তুচ্যুতের প্রবণতাকে জীবিকা হারানোর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন। দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে বেশিরভাগ সময়ই এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জীবন-জীবিকা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ কারণেই তারা অন্যত্র পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছেন। আহমেদ ও নিলউর্মি (২০০৮)-এর গবেষণা মতে, যে কোন দুর্যোগের পরপরই বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকাতে বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. বাংলাদেশে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি ও ভবিষ্যত প্রবণতা

বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি দুঃস্বপ্নময় পরিস্থিতির সংকেত বহন করছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এই ঘনবসতিপূর্ণ ও দারিদ্রপ্রবণ দেশকে স্বল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সামর্থ্য নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। যার ফলে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এরই মধ্যে সুপেয় পানির সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্যগত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং 'জলবায়ু হট স্পট' হিসেবে চিহ্নিত সর্বাধিক বিপন্ন এলাকাগুলি থেকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে।

UNFCCC-এর মতে বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশসমূহ, উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ এবং আফ্রিকার সকল দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। সেই মতে বাংলাদেশ একটি দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে এমন বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Global Climate Risk Index-2012 এর প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার হচ্ছে জলবায়ু তাড়িত সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং এ সকল ঝুঁকির মধে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা এবং খরা, যার কারণে প্রতিবছর এসকল দেশে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটছে।

IOM এর গবেষণা প্রতিবেদনে (Climate Change and Migration in Bangladesh, Assessing the Evidence) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পবির্তনজনিত স্থানান্তর ও অভিবাসন এর কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে চিহ্নিত করা হয়েছে;

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্রুত গতিতে সংগঠিত (Sudden onset events) প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ (যেমন ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস, হঠাৎ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি) এবং এর ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ধীর গতিতে সংগঠিত (Slow onset process) পরিবেশগত দুর্যোগসমূহ (যেমন দীর্ঘকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, সুমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি) এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে।
- ভবিষ্যত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল নেওয়ার জন্য মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও সামাজিক এবং গোষ্ঠীগত দন্দ্ব-সংঘাত, যার ফলে স্থানান্তর এবং অভিবাসন।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য ২০০৯ সালে "জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯" প্রণয়ন করেছে। সেখানে সরকার বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং বলেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে এবং এর প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে আগামীতে উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রায় দুই কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৬. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামোঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ক. ধনী দেশগুলোর অব্যাহত নেতিবাচক প্রচারণা, জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর অধিকার আদায়ের পথে অন্তরায়

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতদের স্থানান্তর (movement), বসতি স্থাপন (resettlement), পুনর্বাসন (rehabilitation) ও প্রত্যাবর্তনের (reintegration) অধিকারের প্রশ্নটি বারবার উচ্চারিত হলেও এখন পর্যন্ত কোন প্রকার আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়নি। জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি নিয়ে ধনী দেশগুলো তাদের নেতিবাচক প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। তারা বলার চেষ্টা করছে যে, জলবায়ু উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে তাদের দেশে অভিবাসনের সুযোগ করে দিলে নিরাপত্তা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তারা জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট দেশের নিজস্ব নীতি ব্যবস্থাপনায় সমাধান করার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং বিষয়টিকে ক্রমাগত প্রলম্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ন্যায়সংগত অধিকারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

আইনী কাঠামো তৈরির প্রশ্নে ধনী দেশগুলো জলবায়ু উদ্বাস্তু সংজ্ঞা প্রণয়ন (এখানে উল্লেখ্য যে জলবায়ু পরিবর্তজনিত বাস্তুচ্যুতি না পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতি) নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করছে। বিষয়টি অহেতুক এই কারণে যে, পরিবেশ বিপর্যয়ের (Enviornmental Degradation) প্রধান কারণ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে ধনী দেশগুলোর প্রণীত ভ্রান্ত উন্নয়ন নীতি-পরামর্শ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভ্রান্ত উন্নয়ন পরামর্শের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছে এবং এর ফলস্বরূপ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র স্থানান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। সকল দেশেই এর উদাহরণ রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশে চিংড়ি উৎপাদনের নামে চকরিয়া সুন্দরবন ধ্বংস এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এসকল এলাকার লাখ লাখ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা হারিয়েছে এবং অন্যত্র চলে গেছে। এডিবি'র পরামর্শে বাস্তবায়িত খুলনা-যশোর সেচ প্রকল্পের কারণে এই দুই জেলাতেই লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলবাবদ্ধতা এবং সুপেয় পানির অভাব এবং লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে, যে কারণে মানুষ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট উদ্বাস্তু, এই দুটোর জন্যই ধনী দেশগুলোর ঐতিহাসিক দায় রয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এই দায় নিতে হবে এবং জলাবায়ু বাস্তুচ্যুতদের আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

খ. জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে কপ (CoP) প্রক্রিয়া একরকম ব্যর্থ

IPCC'র সকল প্রতিবেদনে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে সমর্থন করা হলেও জাতিসংঘ প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সমঝোতা আলোচনায় উক্ত বিষয়ে তেমন কোন আলোচ্যসূচি সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হয়তো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘ বর্তমান চলমান প্রক্রিয়াটি প্রশমনের উপর অধিকতর মনোনিবেশ করছে অথবা ধনী দেশগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আমাদের কাছে দ্বিতীয়টিই মনে হচ্ছে, কারণ আমরা এক্ষত্রে কপ (বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা) প্রক্রিয়ার ক্রমাগত ব্যর্থতা ও জাতিসংঘের নিরব ভূমিকায় উদ্বিগ্ন। তবে জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন আলোচ্যসূচি গৃহীত না হলেও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে চাপ ছিল, যে কারণে উক্ত বিষয়ে ২০১০ সালে কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক নামে একটি কার্যসূচি গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতিদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা প্রণয়ন করা

এবং সকল দেশ বিশেষ করে ধনী দেশসমূহ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের ব্যবস্থাপনায় (পরিকল্পিত স্থানান্তর ও পুনর্বাসন যে দেশের জন্য যা প্রযোজ্য) কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে জাতিসংঘের নিরব ভূমিকার কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে এবং উক্ত বিষয়টি এখন আর আলোচনায় নাই।

৭. আমরা কেন জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের অধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া এবং নীতি কাঠামো দাবি করছি

ক. বাংলাদেশের একার পক্ষে বিষয়টি সমাধান করা সম্ভব নয়

বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র এবং জনবহুল দেশ। বর্তমানে এদেশে জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ এবং শহর এলাকায় ২৫০০০ এর বেশি লোক বাস করছে যা বৈশ্বিক প্রতি গড় জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৪০% দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। অধিক জনবহুল দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনিতেই খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনুমান করা হচ্ছে যে, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশটির মোট জনসংখ্যা দাঁড়াতে পারে ২২৬ মিলিয়ন এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১৩০০।

যুক্তিসংগত কারণেই এই বাড়তি জনসংখ্যা দেশের খাদ্য, পানি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর চাপ তৈরি করবে। এর বাইরেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে জীবন-জীবিকার তাগিদে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে অভিবাসিত হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া একথাও স্বীকার করতে হবে যে, দুর্যোগ পূর্বেও ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে। কিন্তু এসকল দুর্যোগের ব্যাপকতা, পুনপৌনিকতা এবং তীব্রতা যেভাবে বেড়েছে তা অবশ্যই দীর্ঘসময়ের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হিসেবে যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৪০-৪৫ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই বিশাল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দেশের ভূমি ও অর্থনীতির উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে এসকল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সচল রাখার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর সামর্থ্যের অভাবে দারিদ্র্য আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে সরকারকে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়টি বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব হবে না, বিশেষ করে এর ভৌগোলিক ও সম্পদ সীমাবদ্ধতার কারণে। সুতরাং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতি সহায়তা বাংলাদেশের মতো সকল জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশ এবং দ্বীপ দেশসমূহকে কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

খ. ধনী দেশগুলোর দায় রয়েছে যা শুধু অর্থ দিয়ে মীমাংসযোগ্য নয়

ধনী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি মানবিকভাবে স্বীকার করলেও এর দায়-দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। বরং তারা এটাকে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে রেখে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নেওয়ার জন্য জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে এবং তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিজেদের দায়মুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু বিষয়টি আসলে অত সহজ নয়। কারণ প্রথমত ধনী দেশগুলো তাদের নিজেদের ভৌগোলিক সামর্থ্য ও জাতীয় সম্পদ দ্বারা বিষয়টি সমাধানের কৌশল দেখালেও জলবায়ু বিপদাপন্ন অনেক দেশেরই সেরকম সামর্থ্য নাই। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি, এখানে ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের পূনর্বাসন করা সম্ভব নয়। একইভাবে দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ যেগুলো নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা করা হয়েছে এমন দেশের জনগোষ্ঠী কিভাবে অন্যত্র পুনর্বাসিত হবে, তার কোন কৌশলও নির্ধারণ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত ধনী দেশসমূহের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা ও পরিপালন বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অতীতে তারা আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ভঙ্গ করার নজির রয়েছে।

গ. আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামোর দুর্বলতা এবং নতুন নীতিমালা প্রণয়ণে অনীহা

জাতীয়ভাবে বিভিন্ন দেশে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য কিছু নীতিমালা প্রণয়ণ হলেও আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন নতুন আইনী নীতি ও কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, ফলে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের অধিকার বিষয়টি ক্রমান্বয়েই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে জলবায়ু উদ্বস্তুদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতিসংঘ সুরক্ষা নীতিমালা (UN Guideline Principal on Internal Displacement 1998) প্রণয়ন করা হলেও তার বাস্তবায়ন ছিল মূলত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে। জাতিসংঘ প্রণীত এই নীতিমালা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমকারী জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে এ বিষয়ে দায়ী ধনী দেশসমূহ তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বসমূহ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। দুর্যোগকালে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতি এবং সেচ্ছা অভিবাসন নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে এখন পর্যন্ত তার কোন সমাধান এবং বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতি এবং সীমানা অতিক্রমকারীদের অভিবাসন নিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য মতামতও গঠন করা যায়নি। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে এবং সীমানা অতিক্রমকারী অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক এবং সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ণ সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে জলবায়ু উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুতির সমস্যা আরও কঠিন অবস্থায় পরতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এবং এক্ষেত্রে সমস্যাটি নিয়ে জাতিসংঘের বর্তমান নিরবতায় ভবিষ্যতেও জলবায়ু উদ্বাস্তুর বিষয়ে কোন আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট শংকা রয়েছে।

ঘ. জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগই বা কতটা কার্যকর?

জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার দুর্বলতায় এর বাইরেও জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চলছে। ২০১২ সালে নানসেন ইনিশিয়েটিভ (Nansen Initiatives) নামে এমন একটি প্লাটফরম গঠন করা হয়েছে। নরওয়েজিয়ান এবং সুইস সরকারের উদ্যেগে গঠিত এই প্লাটফরমের সদস্য অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কোস্টারিকা, জার্মানি, কেনিয়া, মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন। এর বাইরেও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (UNHCR) এবং আন্তর্জাতিক বাস্তুচ্যুতি সংস্থা (International Organization for Migration-IOM)এর আমন্ত্রিত সদস্য। কিন্তু জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে এই প্লাটফরমের কার্যপরিধি খুবই সীমিত। কারণ এই প্লাটফরমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষা, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ও সীমানা অতিক্রম, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসন বিষয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীক ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিপালনীয় কর্মসূচিসমূহ চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়ন কৌশলের উন্নয়ন করা। এসকল কর্মসূচি বর্তমান কর্মকাঠামো ও নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে জাতিসংঘ মানবাধিকার আইন (১৯৪৭), ১৯৯৮ সালে গৃহীত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই যতটা সম্ভব বাস্তবায়ন করার কৌশলে জোর দেওয়া হচ্ছে। এখানে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থাপনা নিমিত্তে পৃথক আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো, কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়নের বিষয়ে কোন অলোচনা এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এডভোকেসির সরাসরি তোমন কোন উদ্যোগ নাই। যে কারণে এটা মনে করা হচ্ছে যে, নানসেন ইনিশিয়েটিভ এবং এর বর্তমান প্রক্রিয়া জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহায়তা দিতে খুব একটা সমর্থ হবে

না। তবুও এটি একটি ভাল উদ্যোগ, কারণ দুর্যোগ কালে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনায় ও ভবিষ্যত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐকমত্য অবশ্যই সম্ভাব্য উদ্বাস্তুদের সহায়তা করতে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৮. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের অধিকার আদায়ে এই মুহূর্তে আমাদের প্রস্তাবনা এবং দাবিসমূহ

তবে একথা বলা যাবে না যে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে নানসেন ইনিশিয়েটিভের বর্তমান প্রক্রিয়াকে আরও সম্প্রসারণ করবে না। কারণ এটা আগেই বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে বর্তমানে এক কার্যক্রম সীমিত হলেও এটা আমরা বলতে পারি জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে একটি কার্যকর আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই এর আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার বাইরে এসে সমাধান খুঁজতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই এই প্লাটফরমের উদ্যোগে আঞ্চলিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য বৈশ্বিক সমাধানের পক্ষে জোড় দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় শহর খুলনায় আগামী ৩-৪ এপ্রিল ২০১৫ দু-দিনব্যাপী একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা উক্ত কর্মশালা এবং নানসেন ইনিশিয়েটিভের বর্তমান প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত, আলোচনা এবং বিবেচনার দাবি করছি;

ক. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল উন্নয়ন আলোচনায় জলবায়ু উদ্বাস্তুর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

ইতিমধ্যেই এমডিজি পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী এসডিজি প্রণয়ন শুরু হয়েছে এবং তা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের কথা বললেও সেখানে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোন আলোচনা এবং লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। আমরা মনে করি এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে কোন উন্নয়ন লক্ষ্যই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং এসডিজি লক্ষ্যসমূহে অবশ্যই জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি, উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনার বিষয় এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। আগামী মে'২০১৬ সালে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন (World Humaniterian Summit) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের স্থানান্তর, স্থায়ী-অস্থায়ী অভিবাসন অধিকার বিষয়ে আলোচ্যসূচি থাকতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় স্থির করতে হবে।

খ. ইউ এন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করা জরুরি

বৈশ্বিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্যই জাতিসংঘ গঠিত হয়েছেল। কিন্তু মানবাধিকার নিশ্চিতকরনে জাতিসংঘের নীরব ভূমিকার কারণে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি এ অবস্থা কাটিয়ে উঠা উচিৎ এবং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমকারী জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর, স্থায়ী-অস্থায়ী অভিবাসন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউ এন প্রক্রিয়াকে সক্রিয়করনর মাধ্যমে একটি আইনি প্রটোকল এবং সুনিদৃষ্ট কর্ম কাঠামো প্রণয়ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কপ (CoP) প্রক্রিয়াতে জাতিসংঘের মাধ্যমেই জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়টির উপর পৃথক আলোচ্যসুচি রাখতে হবে এবং আইনী প্রটোকল প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সুনিদৃষ্ট কর্মকাঠামোর ঘোষণা দিতে হবে। উক্ত প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা এবং স্থায়ী-অস্থায়ী অভিবাসন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সকল দেশ তার পরিপালনীয় দায়-দায়ীত্ব বাস্তবায়ন করবে।

গ. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরন করতে হবে

আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের তাৎক্ষণিক এবং প্রয়োজনে স্থায়ী অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভিসা প্রক্রিয়ার সহজীকরণ করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে সার্কের সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুতদের সহজ গমনাগমন নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার উপর অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সক্ষম হবে এবং তাদের জীবন-যাত্রা সহজ হবে বলে আমরা মনে করি।

ঘ. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের উদাহারন সৃষ্টি করা প্রয়োজন

যেহেতু নানসেন ইনিশিয়েটিভ প্লাটফরমের প্রধান উদ্দ্যেশই হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহকে সরলীকরণ করা এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাধারণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা। সেক্ষেত্রে বলা যায় বাংলাদেশ তাদের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থাপনায় কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি-কৌশল প্রণয়নে সমর্থ হয়নি। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি বা অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা রয়েছে তা বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সরকারের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালাসমূহ প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ সকল নীতিমালায় জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি এবং এর অভিযোজন অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে কোনভাবেই কার্যকরভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুগণ তাদের বেঁচে থাকা ও জীবন-জীবিকার লক্ষ্যে অপরিকল্পিত নগরকেন্দ্রিক অবিভাসনের চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন ধরনের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

সুতরাং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অভিবাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদহারণ তৈরি করতে হবে। সেটি সম্ভব হবে যদি আমরা আমাদের দেশে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়টি ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র কী হবে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং দাবিও জোরালো হবে বলে আমরা মনে করি।

যোগাযোগ: সৈয়দ আমিনুল হক: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, রেজাউল করিম চৌধুরী: ০১৭১১৫২৯৭৯২
বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, সড়ক ২, শ্যামলী ঢাকা। ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫
ওয়েব সাইট: www.equitybd.org